নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২৩, পৃ. ১০৩-১২৬
© ২০১৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে তাবলিগ জামায়াত ঃ অংশগ্রহণ ও ধর্মচর্চায় বৈপরীত্য

মোহাম্মদ মাসুদ রানা[১]

Abstract: For the propagation of Islam, Tabligh Jamaat is a well-known phenomenon in the present day. The organization (Tabligh Jamaat), developed with the intention to invite people to religion and the evaluation of this organization is like sight. The activities of this organization are noticed in almost every village in Bangladesh, even in the neighborhoods. Moreover, the annual 'Bissho Istema' which is organized by Tabligh Jamaat and the mass presence of the devotees there shows the acceptance and popularity of this organization. In this regards the main theme of this article is to highlight the history of the development of Tabligh Jamaat. In particular, this article explores the historical perspective of the development of Tabligh Jamaat in the context of Bangladesh, as well as presenting the debate those have arisen in many quarters over its history. It has been argued here that how the apolitical position of Tabligh Jamaat as separate from other Islamic organizations has become obscure in the fields. Apart from highlighting the perspective of participating in these Tablighi activities, regardless of class, color, gender, and occupation, it has been shown that how Islam reinvigorated itself in the changed context of Bangladesh. Besides that, this article also alludes how the individual life, family life and social life of the person has been affected by the participation of the Tabligh Jamaat. In addition to the contradictory aspects of Tablighi ideology and religious practice, this article also highlighted the importance of viewing Islam as a discursive field.

১.১ ভূমিকা

তাবলিগ জামায়াত ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের একটি ধর্মীয় আন্দোলন। যার মূল লক্ষ্য মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। মূলত ৬টি মূলনীতিকে (কালিমা,নামাজ, ঈলম ও জিকির, একরামুল মুসলিমীন, সহি নিয়ত এবং তাবলিগ বা ইসলামের দাওয়াত) সামনে রেখে এই ইসলাম ধর্মভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে সাধারণ মানুষকে আখিরাত, ঈমান ও আমলের কথা বলে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। সারাবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়াই তাবলিগ জামায়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাবলিগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বাস করেন, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা; আর এই জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা এবং ইসলামের বাণী পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া তাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব।

সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (সা:) এর

---

[১] সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ই-মেইল : masud@juniv.edu

মৃত্যুর পর তার আদর্শস্নাত সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেয়গণের মাধ্যমে ইসলামী দ্বীন, বিধান প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। কিন্তু মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা বিলুপ্তির পর ইসলামী প্রচার কার্যক্রমে ভাটা পরতে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মুসলিম মনিষিদের প্রচেষ্টাও অব্যাহত ছিল। এমনই পরিস্থিতিতে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ ভারতের দিল্লীতে তাবলিগ জামায়াতের সূচনা করেন এবং তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তাবলিগ জামায়াত একটি বহুল প্রচারিত আন্দোলনের রূপ নেয়। ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই তাবলিগ জামায়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে তাবলিগ জামায়াতের বিকাশ। যেখান ধর্মভীরু বহু নারী-পুরুষ দ্বীন প্রচারের এই কার্যক্রমে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছেন। তাবলিগ জামায়াতের ধর্মচর্চা এবং জীবন দর্শনকে পুঁজিকরে নিজের 'আত্মশুদ্ধি'র পাশাপাশি দিকভ্রান্ত মুসলমানদের সঠিক ও দ্বীনের পথে নিয়ে আসার তাগিদ থেকেই তারা এই ধর্মভিত্তিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন। যার ফলে ব্যাক্তির সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসরে এই কার্যক্রমের একটি সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা ইসলামকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এবং ইসলাম কেন্দ্রিক বোঝাপড়ায় আধিপত্যশীল প্রাচ্যবাদী ভাবনার স্থলে নতুন পরিসরে বিশেষ করে ডিসকার্সিভ পথে ইসলামকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনকে সামনে আনছে। আর এই বিষয়গুলো তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে এই প্রবন্ধে।

প্রবন্ধটি একটি গবেষণা প্রতিবেদন[২] এর অংশ। ভূমিকা ও উপসংহার বাদে প্রবন্ধটিকে চারটি মূল অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রথম অংশে তাবলিগ জামাতের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের তাবলিগ জামাতের বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে অপরাপর ইসলামী সংগঠন থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক হিসেবে তাবলিগের অরাজনৈতিক অবস্থান কী করে ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্ট হয়ে উঠে। দ্বিতীয় অংশে গবেষণার প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে তত্ত্বীয় ও এথনোগ্রাফিক উপাত্তের সহযোগে তাবলিগি কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতকে তুলে ধরার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কী করে ইসলাম নিজেকে পুনরায় অঙ্গীকৃত করলো তা দেখানো হয়েছে। চতুর্থ অংশে ব্যক্তি জীবনে তাবলিগ জামাতের প্রভাব নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাবলিগি মতাদর্শ ও ধর্মচর্চার বৈপরীত্যপূর্ণ দিকগুলোকে গবেষিতদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্থাপন করা হয়েছে। যা একভাবে ধর্মচর্চার ডিসকার্সিভ ফিল্ডকে আমাদের সামনে হাজির করে।

---

[২] প্রবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর অর্থানুকূল্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের গবেষণা প্রকল্পের আওতাধীন 'তাবলিগ জামাত : ধর্মচর্চা ও জীবনবোধ' (২০১৬) শীর্ষক অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত।

২.১ তাবলিগ জামায়াত কি?

বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াত পরিচালনার সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো তাবলিগ জামায়াত। এটি কোনো স্থানীয় সংগঠন নয় বরং বৈশ্বিক ইসলামিক আন্দোলনের অংশ। মূলত হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) ভারতের নিজামুদ্দীন ওয়ালী মসজিদ কেন্দ্রিক যে ইসলামিক দাওয়াতের কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন তাই এখন পৃথিবীব্যাপি তাবলিগ জামায়াত আন্দোলন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে তাবলিগ জামায়াতের নামকরণ আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়েছিল কীনা তা জানা যায় না। এই জামায়াতের প্রধান কাজই যেহেতু দ্বীনের তাবলিগ করা, সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই এ জামায়াত মুখে মুখে তাবলিগ নাম ধারণ করেছে। তবে এই নাম ছাড়াও এ জামায়াতকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে যখন এ জামায়াতের বার্ষিক ইজতেমা ভারতের ভূপালে অনুষ্ঠিত হতো, অনেকে তখন একে ভূপালি জামায়াত বলে অভিহিত করতেন। এ জামায়াতের অন্যতম সংগঠক মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) এ জামায়াতকে বিশ্বাসের আন্দোলন (তরিকা-ই-ইমান) এবং দ্বীনি দাওয়াত বলে অভিহিত করেছেন (সিকান্দ ২০০২)। তাছাড়া একে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনও বলা হয়েছে। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব একে আত্মার সংশোধনের একটি সমবেত আন্দোলন বলেছেন। জামায়াত-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা একে সমবেত আন্দোলন বলেছেন। জামায়াত-ই-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের মাওলানা মওদুদীর লেখায় এ জামায়েতের কার্যক্রম দ্বীনি আন্দোলন এবং নীরব আন্দোলন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের একজন প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞানী মেটক্যাফ (২০০৩) একে বলেছেন, আধ্যাত্মিক পুনজাগরণের নীরবতম আন্দোলন। আবার কেউ একে 'নিরপেক্ষ' (হক ২০১০) আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আবার কেউ একে 'ট্রান্স ন্যাশনাল ইসলামিক আন্দোলন' (আশরাফ ও ক্যামেলিয়া ২০০৮) বলেন। অপরদিকে সিদ্দিকী (২০১০) একে বলেন 'আর্ন্তজাতিক ইসলামিক সংস্কার আন্দোলন'। আবার তাবলিগ জামায়াতের অনেকেই একে ভ্রম্রমান দ্বীনি প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং চলমান মাদ্রাসা হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ সকল নামে ডাকা হলেও এ দ্বীনি কার্যক্রমকে আজ বিশ্বব্যাপী তাবলিগি জামায়াত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাবলিগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক মাওলানা ইলিয়াছ মুসলমানদের 'সত্যিকার মুসলমান' হিসাবে পরিণত করার তাগিদ থেকে এর যাত্রা করেন। এক্ষেত্রে তার আহ্বান ছিল "হে মুসলমান! তোমরা মুসলমান হও"। পুরো মুসলিম জাতিকে কুরআন এবং সুন্নাহ'র মতাদর্শ ও চর্চার ভিত্তিতে একত্রিত করার মানসিকতাকে সামনে রেখে তাবলিগি আন্দোলনের সূত্রপাত। যেখানে কোরআনের বাণীগুলোকে সামনে এনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন: *'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং অন্যায় কাজকে বারণ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম'* (সূরা আল ইমরান-১০৪)। *'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের কাজেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে*

তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছুতো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।[৩] *'প্রত্যেকে নিজের পূর্ণতার লক্ষ্যে আল্লাহর বিধান মতো অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দিবে এবং সেই ব্যক্তির থেকে কোন রকম দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকবে না'* (মা'আরিফুল কোরআন ১:১১৯; মালফুজাত-৫২)।

রাসুলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন "*নিশ্চয়ই এই উম্মতের শেষের দিকে এমন জামায়াত তৈরী হবে, যারা প্রথম জামানার লোকদের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর তারা ফিৎনাকারীদের সাথে (হাত দিয়ে বা জবান দিয়ে, কিংবা কলম দিয়ে) মুকাবিলা করবে*" (বাইহাকী শরীফ)।

এই সমস্ত কোরআনের বাণী ও হাদীস প্রচারের মাধ্যমে দিকভ্রান্ত মুসলমানদের ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার কথা বলে তাবলিগ জামায়াত। তাবলিগ জামায়াতের এই ধরনের ব্যাখ্যাকে ইসলামী কমিউনিটির ব্যাখা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যেখানে তাবলিগ জামায়াত হচ্ছে ইসলামের বাণী প্রচারের একটি দল। কিন্তু পলিসি কমিউনিটিসদের কাছে তাবলিগ জামাত তাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হচ্ছে 'সন্ত্রাসবাদের জন্য প্রবেশ দ্বার'। হোসে পাদিলা, রিচার্ড রেইড ও জন ওয়াকার লিন্ড (২০১৫) এদের কাছে তাবলিগ জামাত একটি কট্টরপন্থী সংগঠন। ইভা বোরেগুয়েরো (২০১৪) ভারত ও পাকিস্তানের তাবলিগ জামাতের উপর কাজ করার প্রেক্ষিতে এই আন্দোলন সম্পর্কে ভালো ভাবে বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার দিক টিকে সামনে নিয়ে আসেন। আমেরিকার 'ইনস্টিটিউট অফ পিস' বুরগিওরো'র ভাবনাটিকে গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে এই আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে উৎসাহিত হয়।

তাছাড়া ইসলাম ধর্ম ও শরীয়া ভিত্তিক জীবন ও সমাজ গঠনে গঠিত ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাবলিগ জামায়াতের 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ' এর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন তাদেরকে কখনোই মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় সংকটকালীন মুহুর্ত গুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া আল্লাহ যে সব কাজের মধ্যে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে সফলতা রেখেছেন তন্মধ্যে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথচ তাবলিগ জামায়াতকে এই কাজটি করতে তেমন দেখা যায় না। তাবলিগ জামায়াত পরকালের সুখ শান্তির নিশ্চয়তা বিধানেই বেশী ব্রত; অথচ কোরআনে ইহকালকে ভীষণ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে ধর্মীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কিত সামাজিক কর্মকান্ডের কথা বলা হয়েছে যা তাবলিগ কারীরা এড়িয়ে যান। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এই জন্য তাবলিগ জামায়াতকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে। অনেকে আবার তাবলিগিদের সামাজিক বিষয়সমূহ এড়িয়ে চলার নীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থানের বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখতে চান। তারা এর মাঝে রাজনীতি খুঁজে পান। যেমন ভীর (২০০১) নির্দিষ্ট করে বলতে চান

---

[৩] পবিত্র কোরআন শরীফ (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর); মূল অনুবাদ গ্রন্থ: তফসীর মাআরেফুল কোরআন, জনাব মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ:), বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

তাবলিগ প্রকাশ্যত অরাজনৈতিক সংগঠন এবং এটি তাবলিগের একটি স্বপ্রনোদিত অবস্থান। অর্থ্যাৎ তারা আসলে নিজেদেরকে অরাজনৈতিক একটি সংগঠন বলেই জাহির করতে চায়। এবং এধরনের স্বপ্রনোদিত প্রকাশ আসলে তাদের কার্যক্রম এর প্রসার ও প্রচারেরই কৌশল। আর এই কারণে তারা কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে আত্ন প্রকাশ করে না। বরঞ্চ এর মধ্যদিয়ে তারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র আত্নরুপ (Selfhood) ও পরিচিতিকে (Identity) সামনে আনেন, যাকে তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ বলে দাবী করেন। কিন্তু বাস্তবে তারা যে শক্তিশালী 'আত্ন' চেতনা তৈরি করছে তা সম্ভাব্যরুপে রাজনৈতিক।

তাছাড়া তাবলিগ জামাতের দর্শন হলো নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা মেটক্লাফে (১৯৯৮)। কোন একটি ইসলামিক সংগঠনের যখন এই ধরনের কোন দর্শন থাকে তখন তা যথার্থভাবেই নিজেদের দাবীকৃত অরাজনৈতিক অবস্থানকে আপাত বিরোধী অবস্থানে ফেলে দেয় আশরাফ ও ক্যামেলিয়া ২০০৮)। ভীর (২০০১) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন তাবলিগের রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থানের কোন ভিত্তি নেই। কারণ তাবলিগি আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত তারা কখনোই বলতে পারবে না যে, তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর কোন ধরনের আকাঙ্খা নেই। তাছাড়া একটি রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আত্ন-চেতনার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নতুন টেরিটরি তৈরি করা এবং সেখানে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরীর পথকেই প্রসারিত করে মাহমুদ (২০০৫)। ফলে এই ধরনের কোন সংগঠনই নিজেদেরকে রাজনীতি নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করতে পারে না। এমনকি এহেন পরিস্থিতি- ধর্ম ও রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট পৃথকীকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের যে মডেল ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুসারীরা দাঁড় করান, তার অসাড়তাকে প্রমাণ করে আসাদ (১৯৯৩)। অর্থ্যাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাবলিগি আন্দোলনের অরাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়টি নিয়ে ডিসকোর্স তৈরি হচ্ছে। যা তাবলিগি কর্মকান্ড বিশেষত ইসলাম ধর্ম নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরী করছে। এটি একটি একক শাস্ত্রীয় ইসলামের ধারণার বিপরীতে স্থানীয় পরিসরে ইসলাম চর্চার বৈপরীত্যকে সামনে আনছে। একই সাথে ধর্ম ও রাজনীতিকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত করে দেখার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে আসাদ (১৯৮৬)। যা ইসলামকে একটি 'ডিসকার্সিভ ট্রেডিশন'[৪] হিসেবে বোঝাপড়ার গুরুত্বকে উপস্থাপন করছে। মূলত তাবলিগ জামায়াতকে দেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনার সাপেক্ষে দেখতে হবে। তাহলে তাবলিগ জামায়াতের পুনাঙ্গ পাঠ সম্ভব হবে। নয়তো একটি অংশের সাপেক্ষে অন্য অংশের আলোচনা হারিয়ে যাবে।

---

[৪] ডিসকার্সিভ ট্রেডিশনকে চিহ্নিত করা হয় এর যৌক্তিকতার দ্বারা। ইসলামের ডিসকার্সিভ ট্রেডিশন তৈরি হয় তার অনুসারিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্ম চর্চার দ্বারা। যা আবার ব্যক্তিদের বস্তুজীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যুক্ত।

২.২ তাবলিগ জামাত: উদ্ভব ও বিকাশ

তাবলিগ জামাতের উদ্ভব এর ইতিহাস নিয়ে নানা মহলে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। যারা তুলনামূলক ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন, গবেষণা করেন তাদের কাছে এর বিকাশের বিষয়টি একরকম, অন্যদিকে যারা ইসলামিক গবেষণা ও চর্চায় নিয়োজিত তাদের কাছে এর বিকাশের বিষয়টি ভিন্ন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয়। তাছাড়া যারা তাবলিগ জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দাবী করেন তাদের মাঝেও এর বিকাশের ইতিহাস ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্নধর্মী মতামত লক্ষ্য করা যায়। তবে এর বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কিত ভাবনাগুলো বিশ্লেষণে দুটি প্রবল ধারার উপস্থিতি আমরা খুঁজে পাই। এর মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ধারাটিতে বিশ্বাস করা হয় তাবলিগ আন্দোলনের যাত্রা শুরু ১৯২০ এর দশকে, ভারতে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ইলিয়াছ আলী খান্দলই (সিদ্দিকী ২০১৪)। অন্যধারাটি এই তাবলীগের কাজকে সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হওয়া কোনো কাজ বলে মনে করেন না। বরং তারা বিশ্বাস করেন এই কাজ ইসলামের আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই চলে আসছে এবং উম্মতি মুহাম্মদির জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই কাজ অনেক আগে থেকেই ফরজ করে দিয়েছেন (সিকান্দ ২০০২)। এই ধারণায় বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে তারা কারণ হিসেবে দেখান মুহম্মদ (স:) তাবলিগ কর্মকান্ড সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নিজে এই কর্মকান্ড পরিচালনা করেতেন।[৫] মূলত এই ধারায় বিশ্বাসীরা (তাবলিগি ও সমন্বয়কারী লেখক ও গবেষকগণ) বলতে চান ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (স:) নিজে তাবলিগি কাজ তার জীবদ্দশায় গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং তার উম্মতদের এই কাজ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। ফলে তাবলিগ জামায়াতের উদ্ভব বহু আগে থেকেই হয়েছে, ১৯২০ এর দশকে এসে হঠাৎ করে এর উদ্ভব হয় নি।

প্রথম ধারার সমর্থকেরা তাবলিগকে ধর্মপ্রচার ও প্রসারের আন্দোলন হিসেবে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন এবং ভারতীয় উপহাদেশে এর বিকাশের পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা মুসলমানদের রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের উজ্জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করতে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া মারাঠা শক্তির হাতে মুসলমানদের পরাজয় এবং তৎপরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার আন্দোলনের বেগবানতা কিছু মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের আত্ন পরিচিতি ধরে রাখার ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার করে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দেহবন্দি আন্দোলনের ফল হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে তাবলিগ জামাতের আত্নপ্রকাশ। অর্থাৎ হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাবলিগ জামায়াতের যাত্রা শুরু।

---

[৫] দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে নবীজীর মক্কী ও মাদানী জীবনে সর্বমোট ১২৩ টি জামাত প্রেরণ করেন। এস এম সালেহীন তার "মহান কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাবলিগি জামায়াতের প্রশ্নের উত্তর" নামক গ্রন্থে এই জামায়াতের তালিকা উল্লেখ করেছেন। সেখানে এই সকল জামায়াতের আমিরের নাম, প্রেরণ কাল, মা'মুরের সংখ্যা ও নাম, তাশকিলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম ও সফরের মেয়াদকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

এই তাবলিগ জামায়াতের যাত্রা শুরু হয় উত্তর ভারতে বসবাসকারী ধর্মীয় নেতা মাওলানা ইলিয়াছ আল-খান্দলই[৬] এর হাত ধরে। তিনি কিভাবে এই ধর্মীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হলেন সে বিষয়ে দুটি ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। একটি ব্যাখ্যায় বলা হয় তিনি স্বপ্নযোগে এই কাজ করার আদেশ লাভ করেন, অপর ব্যখ্যায় বলা হয় তিনি তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাশিদ আহমেদ গেংগহির স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই কাজে উদ্বুদ্ধ হন (মাসুদ ২০০০)। এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে উত্তর ভারতে বসবাসকারী রাজপুত এথনিক দল হিসেবে পরিচিত মিয়জ (Meos) জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মেওয়াত প্রদেশে বসবাস করতেন। তারাই প্রথম এই ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন এর অরাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে।

১৯২৬ সালে মাওলানা ইলিয়াছ দ্বিতীয় হজ্জ্ব পালনে মক্কায় গমন করেন এবং সেখান থেকে ফেরার পরেই তিনি মূলত দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করেন। এই কাজকে সহজতর এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে তিনি একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করেন। তিনি 'নুহ' নামক স্থানে জনসমাবেশ করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে মিয়জ জনগোষ্ঠিকে আহ্বান জানান। শুরুতে তার অর্থায়নে মকবুল হাসানের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি জামায়াত ভারতের মেওয়াত প্রদেশের কান্দালায় প্রেরণ করেন। এরপর সমগ্র মেওয়াত প্রদেশে দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে জামায়াত প্রেরণ করা হয়। প্রথম এক দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে তাবলিগি কার্যক্রম প্রসারের পর মাওলানা ইলিয়াছ তার কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৯৩৮ সালে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে সৌদি বাদশাহের সাথে সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে সৌদি আরবে তাবলিগি কর্মকান্ড শুরু করেন। ১৯৪০ এর দশকে এই আন্দেলনের কার্যক্রম আরো বেগবান হতে থাকে। ফলে তৎকালীন বাংলা ও পাকিস্তান অঞ্চলেও জামায়াত প্রেরণ করা হয়। তবে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এর কার্যক্রমের প্রসারতা লাভ করে (আগোয়ানী ১৯৮৬; আহমাদ ১৯৯১)। ১৯৪৬ সালে তাবলিগি দাওয়াতের কাজে হিজায এবং বৃটেনে জামায়াত প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে আমেরিকায় জামায়াত প্রেরণ করা হয়। ১৯৭০-১৯৮০ এর দশকে ইউরোপ মহাদেশে এর বিকাশ ঘটে (মাসুদি ২০১৩)। একই সময়ে আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকাতে এর প্রসার ঘটে। ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডের ডিউসবারি (Dewsbury) মার্কাজি মসজিদ স্থাপন করা হয় যা গোটা ইউরোপের তাবলিগ জামায়াতের হেডকোয়ার্টার হিসেবে পরিচিতি পায় (ব্যালার্ড ১৯৯৪)। ফ্রান্সে তাবলিগ জামায়াত প্রবেশ করে ১৯৬০ এর দশকে। বর্তমানে পুরো বিশ্বের প্রায় ২২৩ টি দেশে এর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৫০ মিলিয়নের মত (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)। যা এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারকেই নির্দেশ করছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে তাবলীগের স্বপ্রকাশ্য অরাজনৈতিক অবস্থানের কারনেই। কারণ এই ধরনের রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান কোন রকম সম্মুখ দ্বন্দ্বে না জড়িয়েই ইসলামিক ও

---

[৬] মাওলানা ইলিয়াস রহঃ ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনার আদর্শের সন্তান। প্রায় শতবর্ষী তাবলিগের এই পথে এসে আজও লাখ লাখ মানুষ নিজের জান, মাল ও সময় ব্যয় করে দ্বীন শিখছেন। অন্যদেরও উৎসাহিত করছেন হেদায়াতের এই নির্মল মেহনতে শরিক হয়ে।

অইসলামিক রাষ্ট্রে তাবলিগি কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার পথকে উন্মুক্ত করে। তাবলিগের এই অরাজনৈতিক পরিচিতি বস্তুত সহিষ্ণুভাবে তাবলিগের দর্শন প্রসারের কৌশল হিসাবে কাজ করে।

২.৩ বাংলা অঞ্চলে তাবলিগ জামাতের বিকাশ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শ নির্মাণে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (আহমাদ ২০০১)। বাংলাদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মতই ইসলামি আন্দোলনের একক কোন রূপ না (জীভরাজ ২০০৭; মাহমুদ ২০০৫, কামালখানি ১৯৯৮) থাকলেও এখানে ইসলামিক আন্দোলনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায় (আহমাদ ২০০১)। বাংলা অঞ্চলে তাবলীগের বিকাশের বিষয়টি নিয়ে নানা মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারায় মনে করা হয় ১৯৪০ এর দশকে ইলিয়াছ আল-খান্দলই এর নির্দেশে বাংলা অঞ্চলে জামায়াত প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে কোলকাতা থেকে দিল্লিগামী একটি জামায়াতে খুলনার মাওলানা আব্দুল আজিজ শামিল হন। যিনি ১৯৪৫ সালে তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশের ঢাকায় তাবলিগি কার্যক্রম সূচনা করেন এবং এই ধারণামতে এরপর থেকে ঢাকার কাকরাইল জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অপর ধারায় বিশ্বাস করা হয় তাবলিগ জামায়াতের কার্যক্রমের বিকাশ ঘটে সপ্তম শতকের শুরুতে নবী করীম (স:) এ মাতৃসম্পর্কীয় চাচা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর হাত ধরে। তিনি একটি জামায়াত নিয়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে সিন্দু অববাহিকা হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর সফর করে চীনে গিয়ে পৌছান (হোসেইন ২০০৬)। চীনের কোয়াংটা বন্দরে এরা কোয়াংটা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে দ্বীন প্রচার করেন। এ থেকে ধারণা করা হয় বাংলা অঞ্চলে দ্বীনি দাওয়াতের বিকাশ ঘটে আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর হাত দিয়ে (রাসিদ ২০১৩)। তবে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ শুরুর সময়কাল নিয়ে বিভাজিত মতামত থাকলেও একথা সকলেই স্বীকার করেন মাওলানা ইলিয়াছ দ্বীনি প্রচারে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে দাওয়াতের কাজ পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৪ সালে তার ইন্তিকালের পর তার পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ ইউসূফ এই তাবলিগি আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যদিয়ে এই আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করেন।

বাংলা অঞ্চলে তাবলিগি কার্যক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যপট প্রাথমিকভাবে সামনে চলে আসে। উপনিবেশিক সময়কালে বাংলা অঞ্চলে তাবলিগি কার্যক্রম শুরু হলেও এতে গতির সঞ্চার ঘটে ১৯৪৫ সালের পর থেকে। ১৯৮৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ কাকড়াইল মারকাজ মসজিদে। ১৯৮৬ সালের পর প্রতিবছর বাংলাদেশে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলেও ইজতেমার জন্য তখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ ছিল না। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরকে ইজতেমার স্থায়ী ভেন্যু বা স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ তীরের ১৬০ একর জমি বিশ্ব ইজতেমার জন্য বরাদ্ধ করেন। তখন থেকেই প্রতিবছর একই স্থানে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দিন দিন লোকসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের ৬৪ জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করে দুই পর্বে বিশ্ব ইজতেমা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান মারকাজ মসজিদ হিসেবে পরিচিত কাকরাইল মসজিদ ছাড়াও বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে বিভাগীয় মারকাজ রয়েছে (আশরাফ ও ক্যামেলিয়া ২০০৮ঃ ৮৫-৮৬)। বিভাগীয় মারকাজ গুলো ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে মনোনীত আমির দ্বারা পরিচালিত হলেও ১৯৯০ দশকের পর থেকে তা কেন্দ্রিয় কাকরাইল মসজিদের শূরা কমিটি'র (যার সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শুরুতে বিভাগীয় আমিররা বিভাগীয় সকল কার্যক্রমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেও, বর্তমানে কেন্দ্রিয় শূরা কমিটির সিদ্ধান্তের দ্বারা তাদেরকে পরিচালিত হতে হচ্ছে। শূরা কমিটির সদস্য নিবার্চনের ক্ষেত্রেও রাজনীতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে শূরা সদস্যদের মধ্যে প্রবল দুটি ধারার কথা জানা যায়। একটি ধারা দিল্লির কেন্দ্রিয় মারকাজের মুরুব্বীর অনুসারী, অপর ধারার সদস্যরা পাকিস্তানের আলমী শূরার অনুগত।[৭] যার ফলে কেন্দ্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা সময়ে বির্তকের সূত্রপাত ঘটে। এমন একটি বির্তক সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লির মারকাজের আমির মাওলানা সাদ'কে[৮] কেন্দ্র মূলনীতিকে করে লক্ষ্য করা যায়। যিনি নিজেকে শূরা কমিটির প্রধান সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে দাবী করেন এবং কোরআন ও হাদিস নিয়ে কিছু বিতর্কিত[৯] মন্তব্য করেন। একে কেন্দ্র করে বির্তক চলতে থাকে।

এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম তাবলিগি আন্দোলন আদতে একটি রাজনৈতিক উৎপাদ (ভীর ২০০১)। সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্মুখ সহযোগিতায় বেড়ে ওঠা এই

---

[৭] তাবলিগের কোন সংকট স্থায়ী হবে না: আল্লাহমা মাহমুদুল হাসান (২০১৭)। আওয়ার ইসলাম [Online]. Available from: https://ourislam24.com/2017/12/26/ # [Accessed 26 December 2017]

[৮] মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর বংশধর। মাওলানা ইলিয়াছের (রহ.) ছেলে মাওলানা হারুন (রহঃ); তারই ছেলে হলেন মাওলানা সাদ কান্ধলভী। বর্তমানে মাওলানা সাদ কান্ধলভী তাবলিগের কেন্দ্রীয় মারকাজ দিল্লি নিজামুদ্দিনের মুরব্বি।

[৯] দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজের বর্তমান মুরব্বি মাওলানা সাদ কান্ধলভী। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কুরআন, হাদিস, ইসলাম, নবী-রাসূল ও নবুয়ত এবং মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেছেন। যে কারণে মুসল্লিদের কাছে বিতর্কিত হয়েছেন। ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকা, কুরআন শরিফের ভুল ব্যাখ্যা, ইসলাম ও ওলামাদের বিরোধিতা, জাহেলি ফতোয়া, মোবাইলে কুরআন শরিফ পড়া এবং শোনা, তাবলিগের নতুন ধারাসহ বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করায় তার ওপর ক্ষিপ্ত হন তাবলিগের মুসল্লিরা (দৈনিক যুগান্তর, ১০ জানুয়ারী ২০১৮)। এছাড়া 'তাবলিগ করা ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না' বলে বক্তব্য দেয়ায় তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা। সেখান থেকে মাওলানা সাদকে এ বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তিনি উল্টো যুক্তি দেন। এ নিয়ে মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। একপর্যায়ে দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুসারী বাংলাদেশের আলেমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন (দৈনিক যুগান্তর, ১২ জানুয়ারী ২০১৮)।

সংগঠনে ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাছাড়া এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং দ্বীনি প্রসারের নানা কৌশলে এর ভিতরকার রাজনীতি পরিষ্কার হয়ে উঠে। এই বিষয়টি প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এথনোগ্রাফিক উদাহরণের আলোকে উপস্থাপন করবো।

বাংলা অঞ্চলে পুরুষদের তাবলিগ জামায়াতের কার্যক্রমের বিকাশের কিছু নথিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া গেলেও নারীদের তাবলিগ জামায়াতের সূচনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না (Huq 2009; Hussain 2010)। তবে বাংলাদেশের মুসলিম নারীরাও ইসলামি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই (হক ২০০৯; হুসেইন ২০১০)। অনেকের মতে বিশেষ করে অনেক তাবলিগি মতাদর্শীরা মনে করেন, তাবলিগি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ যখন তার দাওয়াত কার্যক্রম শুরু করেছিল তখন থেকেই মহিলা তাবলিগি জামায়াতের সূচনা হয়েছিল। মাওলানা ইলিয়াসের এই দাওয়াতি কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে মাওলানা আব্দুস সোবহানের স্ত্রী নয়াদিল্লীতে প্রথম মহিলা তাবলিগি কার্যক্রম শুরু করেন। যার সদস্য ছিল তার সকল নিকট আত্নীয়রা। তাদের মতে, স্বামী কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে তাবলিগি শিক্ষা গ্রহণের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। যেহেতু পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী এবং নারীর প্রভাব পরিবারে সবচেয়ে বেশি সেহেতু নারীকে তাবলিগি কর্মকান্ডে সক্রিয় করতে মুরুব্বিগণ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। আর এইভাবেই মহিলারা তাবলিগি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের পর মাওলানা এহতেশামুল হাসানের আমিরত্বের সময় মহিলাদের জন্য মাস্তুরাত জামায়াত[১০] নামক একটি তাবলিগি কার্যক্রম শুরু করা হয়। যার মধ্যদিয়ে মহিলারা স্বামী কিংবা মাহরামের সাথে তাবলিগি দাওয়াতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরু করে (সিদ্দিকী ২০১৪)। আরেকদল মনে করে হযরত মুহম্মদ (স:) এর সময়েই খাদিজাতুল কোবরা (রা:), উম্মে আম্মারা (রা:), হযরত উম্মে সালমা (রা:), হযরত আয়েশা (রা:) এর মাধ্যমে মহিলা তাবলীগের সূচনা হয়েছিল। অনেকে তাদের দ্বীন প্রচারের কার্যক্রমকে মহিলা তাবলিগ জামায়াতের দ্বীন প্রচারের কার্যক্রমের সাথে মিল আছে বলে মনে করলেও তাদের কর্মকান্ডকে তাবলিগি বলে মনে করেন না।

তাবলিগি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে নানা মতামত থাকলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বিকাশ প্রক্রিয়াটি অনেকটাই পুরুষদের তাবলিগি জামায়াতি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। প্রথম দিকে তাবলিগ জামায়াত এর কার্যক্রমে পুরুষেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতো না (আলি ২০০৩)। তাবলীগের বিভিন্ন লেখালেখিতে মাস্তুরাত জামাত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে "নারীরা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কাজেই পুরুষদের মেহনতের সাথে সাথে মাস্তুরাতের মাঝে দ্বীনের মেহনত হওয়াও জরুরি"(নিজামী ২০০৪; হোসেন

[১০] মাস্তুরাত জামাত নারীদের একটি জামাত, দ্বীনি শিক্ষা লাভ ও প্রচারের উদ্দেশে এই জামাত পরিচালিত হয়। মূলত দ্বীনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এই জামাত প্রেরণ করা হয়। এরা সাধারণত মসজিদে না থেকে এলাকার কোন তাবলিগ জামাতের সাথে যুক্ত পরিবারের বাসায় অবস্থান করে, তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২০০৩)। অর্থাৎ নারীরা মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের মধ্যেও দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া জরুরি। এই ধারণা থেকেই বাংলাদেশে তাবলিগ জামায়াতের কর্মকান্ডের মধ্যে মাস্তরাত তালিম এবং জামায়াত হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে তাবলিগ জামাতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও সামাজিক প্রথা, বিভিন্ন বিধি নিষেধের কারণে এটি পুরুষ তাবলিগ জামায়াতের মতো দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে নি।

৩.১ গবেষণা ক্ষেত্র

আগেই উল্লেখ করেছি যে, আলোচ্য প্রবন্ধটি গবেষণা প্রতিবেদনের অংশ। তাই প্রবন্ধের আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রেক্ষিত ও পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান জরুরি বলে মনে করছি। গবেষণার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে তাবলিগ জামায়াত এর মারকাজ (কেন্দ্র) হিসাবে পরিচিত ঢাকাস্থ কাকরালই মসজিদকে বিবেচনা করার পাশাপাশি ঢাকা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত যাত্রাবাড়ী এলাকা (তাবলিগি পরিচিতি হিসাবে হালকা নং ৪২৫) এবং শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাভারস্থ কলমা (তাবলিগি পরিচিতি হিসাবে হালকা নং ৬১৯) এলাকা দুটিকে বিবেচনা করেছি। মূলত এই দুইটি এলাকায় তাবলিগি কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যাক্তিরাই গবেষণার একক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন এবং এই দুই এলাকার মসজিদ ভিত্তিক তাবলিগি কর্মকান্ডকেই গবেষণার উপজীব্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে এই দুইটি এলাকাকে নির্বাচিত করার অন্যতম কারণ শহর এবং শহরতলিতে তাবলিগি কার্যক্রমকে তুলনামূলকভাবে খতিয়ে দেখা।

এই গবেষণার উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) পদ্ধতি ব্যবহার এর মধ্যদিয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকা ও সাভারস্থ কলমা এলাকায় সর্বমোট ৩০ জনকে তথ্যদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। সংখ্যার বিচারে ৩০ জন তথ্যদাতার মধ্যে ২০ জন পুরুষ অবশিষ্ঠ ১০ জন নারী। এই ক্ষেত্রে দুইজন পরিচিত ব্যক্তির সহয়তা নিয়ে অন্যান্য তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের কৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে তথ্যদাতাদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের ভাবনা, অভিমত ও অভিজ্ঞতা গুলোকে জানার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া কেইসস্টাডি পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে তাবলিগি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট এবং এর প্রভাবের নানাদিক তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা তথ্যদাতাদের প্রকৃত অবস্থা ও তাদের দৈনন্দিন চর্চার নানাদিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করার মধ্যদিয়ে বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হয়েছে। এখানে উল্ল্যেখ্য যে, গবেষণার নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্যদাতাদের নামের অংশে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.১ তাবলীগে অংশগ্রহণ

তাবলিগি জামায়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ইসলামের পথে ডাক দেয়া এবং ইসলামের পথে পরিচালিত করা। তবে এখানে পথভ্রষ্ট মুসলমানদের আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, দ্বীনি রাস্তার নির্দেশনা দেওয়াই মূখ্য উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬টি মূলনীতিকে সামনে আনা হয় এবং এর ভিত্তিতে কাজ করার তাগিদ প্রদান করা হয়। এই মূলনীতি সম্বলিত গ্রন্থ হচ্ছে 'ফাজায়েলে আমল'। মূলত এই বইটিই তাবলীগের মূল বই হিসাবে ব্যবহার করা হয় (নদভী ১৯৯৯)। এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া তাবলিগি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) এর ভাতিজা। মাওলানা ইলিয়াছ তাবলীগের কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে এবং সমগ্র মুসলমানদের একত্রিত করার জন্য যে গাইড লাইন তৈরি করেন এবং তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ যে দিক নির্দেশনা দেন তার ভিত্তিতে 'ফাজায়েলে আমল' গ্রন্থটি রচিত হয়। গাইড লাইনে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে বোধগম্য করে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই ব্যাখ্যাগুলো দূরবর্তী কোন বিষয় হিসেবে বিবেচিত না হয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারার নির্দেশক হয়ে ওঠে। যাকে আসাদ (১৯৯৩) ইসলামিক ডিসকার্সিভ ট্রেডিশন (Discursive Tradition) বলে উল্লেখ করেন। কারণ আসাদ এর কাছে ইসালামিক ডিসকার্সিভ ট্রেডিশন হচ্ছে সে বিষয়, যা তার অনুসারীগণকে তাদের ধর্মীয় চর্চার ধরন ও উদ্দেশ্যকে বাতলে দেয়। এমনকি এটি কোরআন ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যামূলকভাবে তার অনুসারীদের কাছে উপস্থাপন করে। আর 'ফাজায়েলে আলম' গ্রন্থটিও তাবলিগি কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের কাছে তাদের কর্মকান্ডের ধরন ও উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করতে চায় কোরআন ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যামূলকভাবে উপস্থাপনের দ্বারা। তাছাড়া তাবলীগ একজন ব্যক্তির নতুন আত্নরুপ তৈরি করে আত্ন কেন্দ্রিক ধারণার পরিবর্তন ঘটায়। নতুন পরিচয়ে একজন ব্যক্তিকে পরিচিত করে তাবলিগি সাথী ভাই হিসেবে এবং তাকে তাবলিগি কমিউনিটির সাথে যুক্ত করে। এই কমিউনিটির সদস্যরা এক ধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাবলিগি জামাতের নির্দেশিত কিছু নিয়ম ও আচার পালনে বাধ্য থাকে (মেটক্ল্যাফ ২০০৩)। এভাবে তাবলিগি সাথীরা তাবলিগি অন্দোলনে ব্যক্তির অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে। তাবলিগি পরিচিতি প্রদান পূবর্ক তাবলিগ জামায়াত এর অনুসারীদের জন্য একটি নতুন নৈতিক বিশ্বকে (moral world) হাজির করে যা পূর্বতন নৈতিক বিশ্বের সাথে নিয়ত দর কষা-কষির মধ্য দিয়ে যায় (আশরাফ ও ক্যামেলিয়া ২০০৮)।

আলোচ্য গবেষণায় ৩০ জন তথ্যদাতার সাথে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে ভিত্তিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের তাবলীগের কাজে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

আব্দুল আজিজ (৪৫) এর বাসা সায়দাবাদ এলাকায়। মূলত ইসলামপুরে কাপড়ের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন তিনি। ২০১২ সালে তার হার্ট অ্যাটাক হয়। তৎপরবর্তী সময়ে

বেশ কিছুদিন তাকে বাসায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ডাক্তার পরামর্শ দেন। এমতাবস্থায় তার বাসায় স্থানীয় মসজিদের তাবলিগের সাথি ভাইরা[১১] তাকে দাওয়াত দিতে আসেন এবং তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এর আগে আব্দুল আজিজ সাপ্তাহিক নামায হিসাবে জুম্মা'বার ছাড়া মসজিদে গমন করতেন না। কিন্তু তাবলীগের সাথি ভাইদের গাস্ত[১২] এ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের বয়ান শুনার মধ্যদিয়ে তার ভিতরে জীবন দর্শন সম্পর্কে এক ধরনের চৈতন্যের সৃষ্টি হয় বলে তিনি জানান। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত তাবলিগে যাওয়া শুরু করেন এবং বর্তমানে তিনি স্থানীয় মসজিদের তাবলিগ আমির হিসাবে আছেন এবং এটাকে তিনি নিজের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করেন। কারণ এর ফলে সমাজে তার পরিচিতির পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি অভিমত পেশ করেন। আর এই মর্যাদার কারণে তিনি তার মেয়েকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তার ভাষ্য মতে, "এগুলির সবই হয়েছে তাবলিগে অংশগ্রহণ করার ফলে"।

যাত্রাবাড়ী এলাকায় বসবাসকারী আলী হোসেন (২৩) তাবলিগের কাজের সাথে যুক্ত হন তার এস.এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার পরবর্তী সময় থেকে। তাবলিগের কাজে যুক্ত হওয়ার আগে বন্ধু বান্ধবের সাথেই তিনি বেশী সময় কাটাতেন। তাছাড়া বাড়িতে তার মন বসতোনা বলে জানান। এমতাবস্তায় তার অভিভাবকরা তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার বাসনা থেকে জোর করে (আলী হোসেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) তাবলিগের কাজে এক চিল্লার (১ চিল্লা=৪০ দিন) জন্য পাঠান। চিল্লায় থাকাকালীন সময়ে আলী হোসেন তার সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদের সাথী হিসাবে পায় ফলে তাবলিগ যাওয়ার বিষয়টি তার কাছে আর বিরক্তির পর্যায়ে পৌছায়নি। শুরুতে বাসায় ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করলেও কিছুদিন জামায়াতের সাথে অতিবাহিত করার পর তার কাছে তাবলিগের কর্যক্রম ভালো লাগতে শুরু করলো। সে এখন নিয়মিত তাবলিগ করে এবং শরীয়া অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে। আলী হোসেন এর সফল কর্মপ্রচেষ্টায় তার পরিবারের সকল সদস্য এখন তাবলিগের কাজের সাথে জড়িত বলে জানান।

অপরদিকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহসান উল্লাহ (২২) তাবলিগের কাজে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি হঠাৎ করে হয়েছে বলে জানায়। তার হলের রোম মেট তাবলিগ না করলেও নিয়মিত নামায পড়তো এবং আহসান উল্লাহকে নামায পড়ার কথা বলতো। আহসান উল্লাহ তার কথায় খুব বেশী গুরুত্ব দিত না। সে তার নিজের ইচ্ছামত জীবন-যাপনেই অভ্যস্ত ছিল। সে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতো । কিন্তু হঠাৎ করে মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। এর ফলে আহসান উল্লাহ বেশ কষ্ট পায় এবং নিজেকে সঙ্গীহীন ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় একদিন হলে নিজ কক্ষে

---

[১১] যারা তাবলিগি কার্যক্রমের সাথে নিয়মিতভাবে জড়িত তাদেরকে সাথী ভাই হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

[১২] গাস্ত - মসজিদ ও এলাকা ভিত্তিক একটি তাবলিঘি কার্যক্রম, যা সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে তাবলিগের অনুসারীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে, একদল মসজিদে দ্বিন সম্পর্কীয় বয়ান দেন ও শুনেন এবং অপর দল একজন রাহবারের নেতৃত্বে এলাকার মানুষদের দ্বিনের দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

যাওয়ার পথে হলের মসজিদ থেকে তাবলিগের দাওয়াতের এলান শুনতে পায় যে সেখানে (মসজিদে) মাগরিবের পর দ্বীনি বিষয়ে কথা হবে। এই এলান শুনে সে নিজ থেকেই তাবলিগের বয়ান শুনতে মসজিদে বসে। ঐদিন তাসকিল[১৩] করা হচ্ছিল যাতে হলের মসজিদ থেকে একটি জামায়াত আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। তাসকিল কারীর কথা বার্তা, পোশাক এবং সর্বোপরি তার আচরণ আহসান উল্লাহর মনপ্রোত হয় এবং সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তাদের সাথে তিনদিনের জন্য যাওয়ার। এইখান থেকেই তার তাবলীগের যাত্রা শুরু বলে তিনি জানান। আহসান উল্লাহ তিনদিনের জামাতে যাওয়ার ফলে জানতে পারে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাকে কেন পাঠিয়েছেন এবং তার জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। আর এই সম্পর্কিত জ্ঞান তার সম্পূর্ণ জীবন দর্শনকে পাল্টিয়ে দিয়েছে বলে জানান।

জান্নাতুল ফেরদৌস (৩৫) স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে যাত্রাবাড়ীতে বসবাস করেন। বিয়ের আগে তিনি ধর্ম-কর্ম খুব বেশি করতেন না। তার বাসা থেকে এই সব বিষয়ে তেমন কিছু বলাও হতো না বলে তিনি জানান। কিন্তু বিয়ের পর তাকে তাবলিগের কাজে যুক্ত হতে হয়। কারণ তার স্বামী তাবলিগ করেন। শুরুতে সে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাজ করলেও, এখন তিনি স্বেচ্ছায় পর্দা করেন এবং মাস্তুরা জামাতে গমন করেন বলে জানান। তার মতে এই পথেই শান্তি ও সমৃদ্ধি রয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, পূর্বে তার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো টিভি দেখে আর প্রতিবেশী ভাবীদেরসাথে আড্ডা দিয়ে। স্বামী তখন এই বিষয়গুলো পছন্দ করতো না। তাই সংসারে তেমন শান্তি ছিল না। কিন্তু তাবলিগের কাজে যাওয়ার পর সময়ের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে তার বোঁধ তৈরি হয়েছে। সে এখন পরিবারে বেশী সময় দেয় এবং এর ফলে সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে বলে তিনি মনে করেন।

তাছাড়া তাবলিগি কার্যক্রমের যুক্ততার পিছনে কোন বিষয়গুলো তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্যদাতাদের অনেকেই তাদের মতামতগুলো নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফিরোজ (২২) জানায়, "আমার পরিবারের কম বেশি সবাই নামায পড়ে। বাবা নিয়মিত যাকাত দেন। আমরা ইসলাম বলতে শুধু এতটুকুই বুঝতাম। কিন্তু ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার কথা বলে সে বিষয়ে তাবলিগের মাধ্যমে জানতে পারি। ফলে এখন ইসলামিক জীবন বিধান মতো চলার পথটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে, যা তাবলিগ না করলে হয়তো কোনদিনই জানতাম না।"

শান্তা ইসলাম (২০) জানায়, "ইসলাম কি? কিভাবে ইসলামিকভাবে চলা যায়? বিশেষ করে নারীদের ইসলামিক দায়িত্বগুলো কি? বা ইসলামের চর্চার মূলনীতি গুলোর দীক্ষা কী? প্রভৃতি বিষয়ে সম্পর্কে আমি কখনোও পড়াশুনার মাধ্যমে জানতে পারিনি। কিন্তু 'ফাজায়েলে আমল' এবং 'হেকায়েতে সাহাবা' এই গ্রন্থগুলোর সহজ সরল উপস্থাপন

---

[১৩] ওয়াকিয়া বা সাহাবীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা কোনো ব্যাক্তির মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় বা দ্বীনি দাওয়াতের কাজে সময় লাগানোর তাগীদ তৈরী করাকে তাসকিল বলে।

আমাকে ইসলাম বুঝতে সহায়তা করে। তাছাড়া মহিলাদের তালিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি না জানা অনেক বিষয়ে অবগত হতে পেরেছি। বিশেষ করে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে এখানে জানতে পেরেছি। আমি আরো জানতে পেরেছি যে, একজন নারীর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। যা আমার পরিপূর্ণ দ্বীনের পথে চলার পথকে প্রশস্ত করেছে। আর আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এইটাই সঠিক পথ এর মাধ্যমেই সফলতা লাভ করা সম্ভব।"

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে ধর্মীয় আর্দশ বা নিয়মগুলো পূর্বতন লিঙ্গীয় বাঁধাধরা নিয়মগুলোকে বাতিল করে, বিশেষ করে নারীর জীবনের নতুন অর্থ তৈরী করে দেয়। হক (২০০১) তার গবেষণা কাজে একই বিষয় লক্ষ্য করেন বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত নারীদের মাঝে। যা একভাবে পরিবার ও সমাজে একজন নারীর গুরুত্বকে সামনে তুলে ধরে।

তাবলীগে অংশগ্রহণ বা সংযুক্ততার জায়গাগুলো ব্যক্তি বিশেষে আপেক্ষিক হলেও প্রায় সকলেই এই কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আখলাক ও আকিদার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখেন। তাছাড়া তাবলিগি প্রচারণার ধরন, দ্বীনি বিষয়গুলোর সহজ সরল উপস্থাপন এই কাজে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠে। এই কাজে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শর্তাবলী না থাকা, শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহ অবস্থানের মানসিকতা এবং অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অলোকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার মনোভাব এই ধর্মীয় আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রায় প্রতিটি তাবলিগি প্রচারনার কলা-কৌশল। তাবলিগ নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার স্বার্থে এই সমস্ত বিষয়গুলোতে নিজের আত্তিকরন করেছে। যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটছে জনগণের এই তাবলিগি আন্দোলনে অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে।

৫.১ তাবলিগ জামাতের প্রভাব: ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ নেই (আশরাফ ও ক্যামেলিয়া ২০০৮)। এখানে ধর্মের সাথে জটিল সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি নানা মাত্রিক সম্পর্ক কাজ করে (হক ২০১০)। ফলে তাবলিগি নানা মুখী কর্মকাণ্ডে (তিন দিন, এক চিল্লা, তিন চিল্লা) অংশগ্রহণ যখন ব্যক্তির ধর্মীয় মাতদর্শ ও চর্চার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় তখন এর সাথে সঙ্গতি রেখেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষকরে ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক আচরণ এর মতো বিষয়গুলো একজন ব্যক্তির জীবনধারণকে পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এগুলোই ব্যক্তির এজেন্সি'র উৎস হিসেবে কাজ করে (মাহমুদ ২০০৫)। যা আবার সমাজকে তথা ইলামিক সমাজগুলোকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

তথ্যদাতাদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে তাবলিগের প্রভাবের বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তাবলিগের দাওয়াতি কার্যক্রমকে গুরুত্বসহকারে

সামনে আনেন। তারা বলেন, মূলত এই দাওয়াতি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দ্বারাই তারা তাদের পূর্ববর্তী সাধারণ জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন এবং নতুন আদর্শে তাবলিগ জামায়াতি জীবনকে নির্বাহ করছেন। যা তাদের জন্য খুবই সুখকর ও আনন্দের বিষয়। খোদ ইসলামেও দাওয়াতি (Dawah) কার্যক্রমকে সন্দেহাতিতভাবে ব্যক্তির এজেন্সি বোধ এর সাথে সম্পর্কিত করে দেখা হয় (মাহমুদ ২০০৫)। কারণ এটি অপরাপর লোকদের সাথে আধ্যাত্মিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এবং সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদপুষ্ট না হলে এমন কার্যক্রমে জড়িত হওয়া সম্ভবপর হয় না বলে তথ্যদাতারা মনে করেন।

তাবলিগি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বাস করেন তাবলিগি দাওয়াতি কাজে মেহনতের দ্বারা তারা পবিত্র দ্বীনিজীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। আর এই শিক্ষা অন্য কোথা থেকেও পাওয়া সম্ভব নয়। আলোচ্য গবেষণার মাঠকর্ম ভিত্তিক তথ্যেও বিষয়টি পরিস্কার হয় যে, তাবলিগি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এর অনুসারীদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাবলীগের কাজে অংশগ্রহণকারীরা জানান এই কাজে জড়িত হওয়ার ফলে আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে, তাদের ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি তারা ইসলাম চর্চায় সঠিক পথ সম্পর্কে নির্দেশনা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই পরিবর্তনটি ঘরে বসে আনা সম্ভব হয়নি। বরং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান, মাল ও সময় ব্যয় করার মধ্য দিয়ে তারা এই নির্দেশনা লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে কেউ এক চিল্লা, কেউ তিন চিল্লা, কেউ আবার রোজানা তালিম এবং সাপ্তাহিক গাস্ত এর কাজে অংশগ্রহণ করে জানতে পেরেছেন। তারা প্রায় সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, দাওয়াতের তাবলিগি কাজ জীবন সম্পর্কে তাদের নতুন মতাদর্শকে সামনে এনেছে এবং নতুন ধরনের নৈতিক বিশ্ব (moral world) তৈরি করছে। আর একাজে যে যত বেশী নিমগ্ন থাকতে পেরেছে সে ততই সফলকাম হয়েছে। আর এই নতুন ধরনের নৈতিক বিশ্ব তৈরী এবং পূর্বতন নৈতিক বিশ্বের স্থলে এর প্রতিস্থাপনের বিষয়টি ইসলাম কেন্দ্রিক ভাবনায় নতুন ধারার সংযোজন করছে। যা নির্দেশ করছে পূর্বতন ইসলামিক ট্রাডিশন বা বিশ্বাস ও চর্চার ক্ষেত্র কোনভাবেই স্থির কোন বিষয় নয়। বরং বস্তুগত জীবনের সাথে সঙ্গতিরেখে প্রতিনিয়ত এর মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন ঘটছে (আসাদ ১৯৯৩)। তাবলিগি কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। কারণ তাবলিগ কোরআন ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যামূলকভাবে উপস্থাপনের দ্বারা সমসাময়িক বাস্তবতায় এর গুরুত্বকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় রত। ফলে প্রতিনিয়িত এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং একে কেন্দ্র করে এর শূরা সদস্যদের মধ্যে নানা ধরনের তর্ক ও বির্তকের সূত্রপাত ঘটছে। যা একভাবে তাবলিগি আন্দোলনকে সচল রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। আর একইভাবে সংযোজন ও বিয়োজনের বিষয়টির প্রভাব তাবলিগি কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের প্রাত্যহিক জীবন ও জীবনের পরিবর্তন সম্পর্কিত ভাবনাতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে, যাকে Victor Turner এর লিমিনালিটির (Liminality) ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে ভিক্টর টার্নার (১৯৮৭) লিমিনালিটিকে একটি আলো, আঁধারি অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে মানুষ এক স্তর

থেকে অন্য স্তরে পদার্পন করে। এই পদার্পনের বিষয়টি বেশ অপস্পষ্ট তবে মানুষের জীবনের অনিবার্য অংশ হিসাবে থাকে। ঠিক একই ধরনের অনুভূতি আলোচ্য গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যদাতাদের তথ্যেও আমি লক্ষ্য করি।

তথ্যদাতা মুরাদ (২২) জানান, "তাবলিগে যাওয়ার মাধ্যমে আমার ভিতরে পরিবর্তন আসছে, এটা আমি বুঝতে পারছি, তবে কিভাবে পরিবর্তন এসেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমি এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছি, শান্তিতে আছি, আমি শুধুই এতটুকুই বুঝি।" অপরদিকে আসলাম তার অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলতে গিয়ে (২০) জানায়, "আমি আমার এইচ.এস.সি পরীক্ষার পর এক চিল্লা দিয়ে আসি। এর ফলে আমার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। আমি আগে খুবই অগোছালো ছিলাম, খারাপ ছেলে-পেলেদের সাথে মিশতাম, নেশা করতাম। খারাপ ছেলে বলে সমাজ আমাকে পরিচিত করাতো। জীবনের লক্ষ্য কি সে বিষয়ে অবগত ছিলাম না। এখন আমি অনেক নিয়মানুবর্তি হয়েছি এবং আমার জীবনের সঠিক লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি। এখন আমি আমার ধর্ম চর্চাতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। যার ফলে আমার পুরো জীবন চর্চায় পরিবর্তন আসছে। আর আমার এই পরিবর্তন পরিবার ও সমাজে আমার গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়েছে। আমি নিজে এই পরিবর্তনকে উপভোগ করছি। আমি এখন প্রতিদিন মসজিদে তালিম করি। মহল্লার লোকেরা বিশেষকরে মুরব্বীরা আমার তালিম শুনেন ও আমার প্রশংসা করেন। এখন সমাজে আমার পূবর্তন খারাপ ছেলে হিসেবে পরিচিতি নেই। অনেকেই তাদের সন্তানকে এখন আমার মতো হবার উপদেশ দেন। আর এই বিষয়গুলো আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য খুবই আনন্দের এবং একই সাথে গর্বের।"

দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে সামনে আনতে গিয়ে লিমন আহমেদ (৪২) জানান "আগে আমি আমার ক্যারিয়ার, চাকরি, পরিবার, বন্ধু এই সব কিছুকে সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দিতাম । কিন্তু তাবলিগে যাওয়ার মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম এর চেয়ে বড় দায়িত্ব আমার আছে, তাহলো দ্বীনি দাওয়াত প্রচার করা এবং আখেরাতের সম্বল গুছিয়ে যাওয়া। এর ফলে আমি আমার পেশায় পরিবর্তন এনেছি, একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এখন তাবলিগ করে এমন লোকের অধীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে করে দাওয়াতের কাজে কোন ধরনের বাঁধা না আসে। শুরুতে আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে খুবই মনক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু আমি তাকে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার সহযোগে দাওয়াতি কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে সমর্থ হলাম। সেও এখন আমার সাথে মাস্তুরাত জামায়াতে যায়। তাছাড়া প্রতিদিন বাসায় 'ফাজায়েলে আমল' কিতাব তালিম করে। এখন আল্লাহর রহমতে আমাদের পরিবারে পূর্বের তুলনায় অনেক শান্তি বিরাজ করে। আমরা আমাদের সন্তানকে এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাসকরি সন্তানদের দ্বিনের তালিম ও তবিয়্যত শিখানো অভিভাবকদের পবিত্র দায়িত্ব।"

ফাতেমা বেগম (৩৯) জানান, "আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি এই কথা জেনে যে আমার একমাত্র কাজ স্বামী ও সন্তানদের দেখাশুনা করা। কিন্তু তাবলিগের কাজে যুক্ত হয়ে,

তালিমে ও মাস্তুরা জামাতে অংশগ্রহণ করে আমি জানতে পেরেছি আমার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে দ্বীনি দাওয়াত প্রচার করা। ফলে এখন আমার পুরো জীবন দর্শনেই পরিবর্তন এসেছে। সত্যি কথা বলতে এখন আমি নিজেকে বেশি ক্ষমতাবান বলে মনে করি। এই কারণে যে, শুধুমাত্র সংসার দেখাশুনাই নয় দ্বীনি কাজের দায়ভার পুরুষের মতো আমার উপরও আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন। আমি নিজেকে একজন দ্বিনের দায়ী বলে ভাবতে পারি। আমি এখন মাস্তুরাত জামাতের নেতৃত্ব দেই। আমার কথা শুনে এখন অনেকেই দ্বিনি কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এটি আমার জন্য পরম পাওয়া। তাছাড়া শ্বশুড়ালয়েও আমার সম্মান ও মর্যাদার জায়গা তৈরি হয়েছে। এখন আমি পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি; যা পূর্বে পারতাম না।"

গবেষক হিসেবে আমার নিজের তাবলিগ জামায়াতে অংশগ্রহণ (তিন দিনের জামায়াতে) আমাকে অন্যদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনার ও ক্ষেত্রবিশেষে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। তিন দিনের জামাতে সরাসরি অংশগ্রহণ কালে আমি অনেককেই এক চিল্লা এবং তিন চিল্লায় যাওয়ার জন্য রাজি হতে দেখেছি- যা পরবর্তিতে তাদের জীবনের পরিবর্তনগুলো আমার সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সালমান (৩২) সে আমার সহপাঠি ছিল। আমরা একসাথে প্রথম তিন দিনের জামাতে যাই। এক চিল্লা দিয়ে আসার পর আমি তার ভেতর বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আচার আচরণের ভিন্নতা, পোষাকের পরিবর্তন এবং সর্বোপরি তার ধর্ম সম্পর্কিত মনোভাবের পরিবর্তন। আগে সালমান বড়দের দেখলে একদম সম্মান করতোনা, দাড়ি সবসময় কামিয়ে রাখতো, চুল বড় রাখতো এবং হাতে ব্রেসলেট পড়তো। কিন্তু চিল্লা থেকে আসার পর তার আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে এখন ধনী-গরীব সকলকেই সম্মান করে, তার মুখ ভর্তি দাড়ি, চুল ছোট এবং কানে ও হাতে কোন ধরনের সামগ্রী পরেনা। এখন সে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এবং মাথায় পাগড়ী পরতে পছন্দ করে। এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে সালমান জানায়, তার মাঝে আগে ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব ছিল। ফলে সে জানতনা কিভাবে জীবন চর্চা করতে হয়। এখন চিল্লার মাধ্যমে সে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছে। ফলে তার জীবন ধারায় পরিবর্তন এসেছে।

অপর দিকে কান্তা ইসলাম (৩৬) জানায়, "আগে খুব উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা করতাম, ঠিকভাবে পর্দা করতাম না, যে কারো সাথে ঘুরে বেড়াতাম। এখন মাস্তুরা জামাতে যাওয়ার ফলে নারীর চালচলন সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা জানতে পেরেছি। তাবলিগে অংশগ্রহণের পর আমার সবকিছুতে পরিবর্তন এসেছে। এখন আগের চাইতে অনেক বেশি মানসিক শান্তি অনুভব করি।" এই পরিবর্তনের পেছনের কারণ হিসাবে তিনি জানান- আল্লহর প্রতি বিশ্বাস এবং একই সাথে তার আদেশ অমান্য করার শাস্তির বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে তার জীবনে এমন পরিবর্তন এসেছে।

তাবলিগ আদর্শ ও মূল্যবোধ সকলকে সমানভাবে বিবেচনা করার কথা বলে এবং কোন রকম ক্রমোচ্চতাকে এখানে প্রশ্রয় না দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তাবলিগি কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সময়ে এর অনুশাসনগুলো মেনে চলা যেমন সহজ হয়; তেমনি অন্য সময়গুলোতে এর চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার

বিষয়গুলো থেকে যায়। তথ্যদাতারা জানান, কর্তৃত্বশীল সামাজিক পরিসর, পুরুষতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মানসিকতা এর প্রকৃত চর্চার অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাবলিগি কর্মকান্ডে অবস্থানকালীন সময়েও ক্রমোচ্চতার বিষয়গুলো ক্রিয়াশীল থাকে বলে অনেকে মত দেন। তবে তাবলিগি কর্মকান্ড অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আদর্শ ও মূল্যবোধ এর প্রভাবের বিষয়টি সীমিত পরিসরে হলেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, উপার্জনমূলক কাজে যুক্ততা, চিকিৎসা ক্ষেত্র, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনোদনের ধারণা, পরিবার সংক্রান্ত বোঝাপড়া, বৈবাহিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই প্রভাবের দৃশ্যমানতা আমার পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এই প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণভেদে (যেমন: তিনদিন, তালিম, এক চিল্লা) যেমন ভিন্ন হয়; তেমনি একই কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এর চর্চার বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যে, ইসলামিক চর্চার ধরনকে এখন আর কোনভাবেই নিস্পত্তিকর সীমানায় বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। অর্থ্যাৎ একক কোনো মনোলিথিক ইসলামের অবয়র দাঁড় করানো সত্যিকারভাবে ইসলামকে অধ্যয়ন ও বোঝাপড়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (আসাদ ১৯৮৬)। যারা ধর্ম চর্চার সাথে জড়িত তাদের আইডিয়াগুলোকে সিরিয়াসলি পর্যালোচনা না করে ঢালাওভাবে যদি ঘোষণা করা হয়, এরা একটি মিথ্যা আর্দশের বুলি তাহলে কোন কাজের কাজ হবে না (মাহমুদ ২০০৫)। তার মানে ইসলামকে এখন ব্যাখ্যামূলকভাবেই দেখাই প্রাসঙ্গিক হবে (আসাদ ১৯৯৩)। বিশেষকরে ইসলামিক সমাজের বস্তুগত জীবনের সাথে এর চর্চা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলনের আলোকে ইসলামকে দেখলে এর বোঝাপড়ার জায়গাটি পরিষ্কার হবে। এক্ষেত্রে তাবলিগি কর্মকান্ড থেকে গ্রহণ করা শিক্ষা ব্যক্তি কতটা কার্যকরভাবে তার প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারছে সেটা বিবেচ্য বিষয়। পাশাপাশি ব্যক্তিভেদে পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হওয়ার কারণেও তাবলিগি কর্মকান্ডের প্রভাব ভিন্ন হয় একথা বলা যায়।

৫.২ তাবলিগি মতাদর্শ এবং অনুগামীদের ধর্মচর্চায় বৈপরীত্য

তাবলিগি মতাদর্শ অনুযায়ী জীবনচর্চার বিষয়টি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন থেকে আলাদা। কারণ তাবলিগ এমন এক জীবন দর্শনকে সামনে আনে যেখানে ইহকালের তুলনায় পরকাল বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ পরিচিত হলেও পুরোপুরিভাবে এর ধর্ম চর্চায় কোন একক রূপের উপস্থিতি চোখে পড়ে না (হুসেন ২০০৬)। এর কারণ ধর্মীয় মতাদর্শ এবং অনুগামীদের ধর্মচর্চায় বৈপরীত্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে ঠিক একই বিষয়ের অবতারণা ঘটে। যেখানে দেখা যায়, তথ্যদাতাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক আছেন যারা বংশ পরম্পরায় তাবলিগ করছেন বা তাবলিগি কাজের সাথে যুক্ত আছেন। বেশীরভাগই জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তাবলিগ জামায়াতের আদর্শ ভালো লেগে যাওয়ায় এই পথে চলে এসেছেন। তাছাড়া একই পরিবারের মধ্যে সকলেই তাবলিগি চর্চা করছেন এমন পরিবারও গবেষণায় খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি।

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সকলেই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে তাবলিগের অনুসারি হয়নি। নানা বিষয় এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া তাবলিগে যারা নিবিষ্ট থাকার চেষ্টা করছেন তাদের নিজেদের মনের ভিতর নানা বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। তাবলিগ জামায়াতে অংশগ্রহণের পূর্বের এবং পরের জীবন যাপনের বিশাল পার্থক্যের কারণে ব্যক্তিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে নানা প্রশ্ন ও বাঁধার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি এই ধরনের প্রশ্ন, প্রতিরোধ, দ্বন্দ্বের প্রভাবে এই পথ থেকে সরে আসে। আবার কেউ কেউ সমস্ত বিষয়কে উপেক্ষা করে এই পথকেই আকড়ে ধরে থাকতে চান। কেউ আবার মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে নিজেকে রেখে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাবলিগি মতাদর্শ এবং অনুগামীদের ধর্মচর্চায় বৈপরীত্য দেখা দেয়। ধর্ম চর্চায় বৈপরীত্য বা ধর্ম কেন্দ্রিক বিশ্বাস ব্যবস্থার নানা সংশয় এবং বাঁধা, বাস্তবে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিসরে ফলদায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এটি ধর্ম চর্চার একটি ডিসকার্সিভ ক্ষেত্র উন্মোচন করে। যেখানে পরিবর্তিত প্রেক্ষপটে মানুষের ধর্মচর্চার যৌক্তিকতার বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনার সুযোগ তৈরী হয়। কারণ একটি ধর্ম যৌক্তিক হয়ে উঠে এর টেক্সট, ইতিহাস, এবং প্রতিষ্ঠান গুলোর দ্বারা, যা আবার এর অনুসারীদের প্রাত্যহিক চর্চার উপর নির্ভরশীল থাকে (আনজুম ২০০৭)। নতুন নতুন ভাবনা ধর্ম চর্চার ধরন ও উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে নিয়ে আসার ক্ষেত্র তৈরি করে। যেমনটি আমরা ডীব ও হার্ব (২০১২; ২০১৩) এর লেবাননের প্রেক্ষাপটে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর করা গবেষণা কাজে দেখতে পাই। সেখানকার যুবকরা এমন একটি নৈতিক জীবনের প্রত্যাশী ছিল, যেখানে তারা অবসরকে (Leisure) নিজেদের মতো করে যাপন করার অধিকার রাখবে। কিন্তু তাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি, তাদের এই প্রত্যাশা পূরণে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। আর এর মোকাবিলায় যুবারা তখন তাদের পূর্বতন নৈতিক ও ধর্মীয় মানদন্ডের নতুন অনুক্রম তৈরী করে এবং এর মধ্য দিয়ে একটি জটিল প্রেক্ষাপটে ইসলামকে একটি কমিউনিটি হিসাবে আত্মপ্রকাশে অবদান রাখে। গবেষিতদের প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা নানা অস্বস্তি এবং বিপত্তি গুলোর মধ্যে তাদের ধমচর্চার বৈপরীত্যের দিকগুলো পরিস্ফূটিত হয়।

মাসনুনা করিম (১৮) ঢাকার একটি কলেজে পড়াশুনা করেন। আধুনিক ফ্যাশনের কাপড় ও সাজসজ্জা তার পছন্দ ছিল। কিন্তু তার বাবা তাবলিগ করে, ফলে তিনি এগুলো পছন্দ করতেন না। এমতাবস্থায় মাসনুনা বাবার অধীনে থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়েই বোরকা পড়া শুরু করেন বলে জানান। তবে তিনি কলেজে গিয়ে বোরকা খুলে ফেলেন। আবার বাসায় ফেরার পথে বোরকা পড়েন। মূলত তার এভাবে পর্দা করার পেছনে কোন ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শ কাজ করেনি। সে তার বাবার তাবলিগি বিশ্বাসকে বাবার সামনে জাহির করতে এই ধরনের চর্চা করে থাকেন।

অপরদিকে ছামিহা আক্তার (২৭) ছোট বেলা থেকেই তাবলিগি পারিবারিক আবহে বেড়ে উঠেন। তার কাছে তাবলিগি কর্মকান্ড খুব ভাল লাগে। কিন্তু বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ছামিহার নামায-রোযা এবং পর্দা করাকে ভাল চোখে দেখলেও, বাড়ীর বাহিরে গিয়ে তালিমে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে মেনে নিতে পারে নি। তাছাড়া

তার স্বামীও বিষয়টি পছন্দ করতো না। ফলে ছামিহাকে তালিম করা, তালিম শুনা এবং মহিলা জামায়াতে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে হয়।

তথ্যদাতা আসিফ (২১) শখের বসে তাবলিগি কাজে গিয়েছিল বন্ধুদের সাথে, ঐখান থেকে ফিরে এসে তার সকল বন্ধুরা তাবলিগি কাজে মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামী কায়দা-কানুন মেনে জীবন-যাপন শুরু করে। এমতাবস্থায় তার উপর এক ধরনের চাপ আসে তার পরিবার এবং বন্ধু মহল থেকে; যে, সে কেনো ওদের মতো হচ্ছে না। এই চাপবোধ থেকে সে ইসলামী পোষাক পরিধান করতে শুরু করে, কিন্তু সে এই বিষয়টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথও খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ তার মনের মাঝে এই ভয়ও কাজ করে যদি পোশাক পরিধান করা ছেড়ে দেয় তাহলে সমাজের চোখে সে খারাপ ছেলে বলে বিবেচিত হবে। আবার অন্যদিকে গোনাহ্‌র ভয়েও সে এই কাজটা ছাড়তে পারছেনা।

অপরদিকে নাজমুস সাকিব (২৩) তাবলিগি কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকতে চায় কিন্তু তাবলিগের কাজে ঘর ছেড়ে বাহিরে যাওয়ার বিষয়টিকে সে ঠিকভাবে মেনে নিতে পারে না। সে তালিম করা পছন্দ করে, তাই নিয়মিত তালিমে যায়। কিন্তু তালিমে গেলে সকলেই তাকে দ্বীনি দাওয়াতি কাজে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কথা বলে। এই বিষয়টি তার কাছে চাপ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই অন্য সকলের কথা যাতে না শুনতে হয়, এই কারণে এখন সে মসজিদে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানায়।

প্রচুর মানুষ তাবলিগের বৃহত্তর কর্মকান্ড ইস্তেমা'তে অংশগ্রহণ করেন ঠিকই, কিন্তু সকলে আবার দ্বীনি দাওয়াতের কাজে বের হন না বা বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেন না। তাছাড়া প্রচুর মানুষ দ্বীন প্রচারে এবং আত্মশুদ্ধির আশায় তাবলিগি কর্মকান্ডে যোগ দিলেও বৃহৎ একটি অংশ এই পথ থেকে ফিরে আসে সামাজিক, পারিবারিক চাপ অথবা ব্যাক্তিক দ্বন্দ্বের ফলে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক চাপ এবং ব্যক্তিক দ্বন্দ্বকে জয় করা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তবে তাদের ভাবনায় এই দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে একটি প্রত্যাশিত ইসলাম প্রতিষ্ঠার তাগিদও লক্ষ্য করা যায়। তারা এমন একটি ধর্ম চায় যা তাদের জীবনের সমস্ত দিকগুলোকে পরিবেষ্টন করবে। যা হবে আধুনিক, অলোচনা সাপেক্ষ এবং গ্রন্থভিত্তিক ইসলাম (আনজুম ২০০৭)। বাস্তবে এটি ইসলামকে একটি ডিসকার্সিভ ট্রাডিশন হিসেবে দেখতে বলে। যেখানে কোরআন ও হাদিসের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনভাবেই নিষ্পত্তিকর বা সীমানির্ধারক নয় বরং ব্যাখ্যামূলক (আসাদ ১৯৯৩)। যা এর অনুসারীদের ধর্মচর্চার ধরন ও উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার ভাবে বাতলে দিবে।

৬.১ উপসংহার

তাবলিগি আন্দোলনের বিকাশ সারাবিশ্বের মুসলমানদের একক মতাদর্শ এবং চর্চায় উদ্বুদ্ধকরনের প্রচেষ্টাকে সামনে আনে। সারা বিশ্বে তাবলিগি আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এখনও মুসলমানদের একটি একক মতাদর্শ একীভূত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাবলিগের উদ্ভব ও বিকাশ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার প্রচলিত বিতর্ক; বিশেষ করে বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রম বিকাশের বিষয়টি নিয়ে গড়ে উঠা নানা ধরনের মতান্তর তাবলিগি আন্দোলনের প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (মাসুদি ২০১৩)। অনেক বিশ্লেষকের কাছে তাবলিগ জামায়াতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিন্দনীয়। বিশেষ করে জঙ্গি সংগঠনগুলো এই সুযোগে তাবলিগ জামায়াতের মাঝে পরিব্যপ্ত হতে পারে। এর ফলে তাবলীগের অরাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী আন্দোলন তার প্রকৃত রূপ হারাতে পারে (হাওয়েনস্টেন ২০০৬)। এই বিষয়টি তাবলিগি আন্দোলনের কর্ণধারদের বিবেচনায় আনা জরুরি। ধর্ম আদতে ব্যক্তির চর্চা ও বিশ্বাসের বিষয়। ফলে ব্যক্তির ধর্ম কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় চর্চার দ্বারা তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অবশ্যই প্রভাবিত হয়। তবে প্রভাবিত হওয়ার মাত্রার বিষয়টি নির্ভর করে বিদ্যমান সামাজিক মতাদর্শের সাথে ব্যক্তির ধর্মীয় মতাদর্শের মিল ও অমিলতার উপর। তাবলিগি মতাদর্শে মানুষের উদ্বুদ্ধ হওয়ার একটি বড় কারণ এর দাওয়াতের কার্যক্রম এবং এর মাঝে আপাতভাবে কোন ধরনের ক্রমোচ্চতার শ্রেণিবিভাজন না থাকা। যা থেকে মানুষের শ্রেণি বিভাজনহীন মুক্ত জীবনের প্রত্যাশার বিষয়টি পরিস্কার হয়। তাছাড়া তাবলিগের প্রসার ও এর উপযোগীতার বিষয়টি নির্ভর করে এর অনুগামীদের প্রাত্যহিক ধর্মচর্চা ও জীবন ধারনের কৌশলের উপর। আর এই ধর্মচর্চা, ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন ধারনের কৌশলের উপর ভিত্তি করে সমাজে ধর্মভিত্তিক ট্রেডিশন তৈরি হয়। যার মূল কাজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দর কষা-কষির ক্ষেত্র তৈরি করা এবং নিজিকে সময়ের আবর্তে যৌক্তিক করে তোলা। তাবলিগি কার্যক্রম ইসলামকে পুনরায় যৌক্তিক করে তোলার একটি কৌশল। অর্থ্যাৎ কিভাবে তাবলিগি আন্দোলন নতুন ধর্ম দর্শন ও নৈতিক বিশ্বকে নবরূপে হাজির করার দ্বারা নিজের ট্রেডিশন তৈরী করছে তা দেখা জরুরি। তাছাড়া খোদ ধার্মিকতার রাজনীতি কিভাবে তাবলিগি কার্যক্রমে জারি আছে তা দেখতে চেষ্টা করা দরকার। কারণ ধর্ম ও রাজনীতি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (জীভরাজ ২০০৭)। তাই ধর্মকে বিশেষ করে ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে কোন একক মানদন্ডে না গিয়ে ডিসকার্সিভ ট্রাডিশস হিসেবে দেখা অনেক বেশী কাজের হবে বলে মনে করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Mumtaz (1991) Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-I-Islami and the Tablighijammat of south Asia. In Martin, E. Marty & Appleby, R. Scoot eds. *Fundamentalisms observed.* Chicago: The University of Chicago press, pp.457-530.

Ahmed, Rafi Uddin (2001). The Emergence of Bengal Muslims, In Ahmed, Rafi Uddin ed. *Understanding The Bengal Muslims: Interpretative essays.* Bangladesh: The University Press Limited.

Ali, Jan (2003). Islamic Revivalism: The Case of the Tablighi Jamaat, *Journal of Muslim Minority Affairs.*Vol.23, no.1, pp 176-177.

Anjum, Ovamir (2007). Islam as Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East.* Duke University Press, Volume 27 Number 3, pp-656-672.

Asad, Talal (1986). The Idea of an Anthropology of Islam, Occasional Paper, Washington, DC: Center for contemporary Arab Studies, Georgetown University.

Asad, Talal (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam.* Baltimoer: Johns Hopkins University press, 28.

Ashraf, H. and Camellia, S. (2008). Dhormo and Social and Culture Constraction of wellbeing in Bangladesh: A case of Tabligjamat, *'Nrivijnana Patrika' Journal of Anthropology* 13: 79-105.

Deeb, Lara & Harb, Mona (2012). Choosing Both Faith and Fun: Youth Negotiations of Moral Norms in South Beirut, *Ethnos: journal of Anthropology.* Routledge, 78:1, 1-22.

Deeb, Lara & Harb, Mona (2013). *Leisurely Islam: Negotiating Geography and Morality in Shi`ite South Beirut.* Princeton: Princeton University press.

Eaton, Richard M. (2001). Who are the Bengla Muslims? Conversion and Islamization in Bengal. In Ahmed, Rafiudding ed. *Understnding the Bengal Muslims: Interoretative essay.* Bangladesh: The University Press Limited.

Howenstein, Nicholas (2006). *Islamist Networks: The Case of Tablighi Jammat.* United States Institute of Peace.

Huq, M. (2009). Taking Jihad and Piety: Reformist Exertions among Islamist Women in Bangladesh. In Fillippo, Osella and Benjamin, Spares eds. *Islam, Politics, Anthropology.* Royal Anthropological Institute: Wiley- Blackwell.

Huq, Samia and Rashid F. (2008). Refashioning Islam: Elite woman and piety in Bangladesh. *Contemporary Islam*, 2 (1): 7-22.

Huq, Samia (2010). *Negotiation Islam: Conservatism, Splinted Authority and Empowerment in Urban Bangladesh.* IDS Bulletein, 41(2): 97-105.

Huq, Samia (2011). Piety, Music and Gender Transformation: reconfiguring women as culture bearing markers of modernity and nationalism in Bangladesh. *Inter Asia Cultural Studies.* Routledge, UK. 12:2, 225-239.

Hussain, Akber (2006). Religion is the Political Process in the context of Bangladesh: A Historiographic Account. *'Nrivijnana Patrika' Journal of Anthropology* 11: 165-180.

Hussain, Naseem A. (2010). *Religion and Modernity: Gender and Identity Politics in Bangladesh.* Women's studies International Forum, 33:325-333.

Jivraj, Suhraiya (2007). Book Review: Politics of Piety: The Islamic Revive and the Feminist Subject. *Feminist Legal Studies*, 15: 247-249.

Kamalkhani, Zahra (1998). Women's Islam: Religious practice among women in today's Iran. *London & New York.* Columbia University Press.

Mahmood, Saba (2005). *The politics of piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject.* Princeton NJ: Princeton University Press.

Masud, Muhammad Khalid (2000). *Travellers in Faith: Studies of the Tablighī Jamā'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal.* Brill, Leiden, Boston.

Masoodi, Ashwaq (2013). *Inside the Tablighi Jamaat.* live mints.

Metcalf, Barbara (1990). Islam and Woman. The Case of the Tablighi jam'at. SEHR, volume 5, Issue 1: *Contested Politics.*

Metcalf, Barbara 2(003). Travelers' Tales in the Tablighi Jama'at, *Annals of the American Academy of Political and Social Science,* 588: 136-148.

Metcalf, Barbara D. (2004). *Islamic Contestations: Essays on Muslims in India and Pakistan.* New York: Oxford University press.

Siddiqi, B. (2014). A case of the Tablighi Jamaat in Bangladesh. *Muslim Diversity Series:* Alochonaa.com

Siddiqi, B. (2010). Purification of Self: Ijtema as a New Islamic Pilgrimage. *European Journal of Economics and Political Studie. 3, pp 133-150.*

Sikand, Y. (2002). *The Origins and Development of the Tablighi-Jam'at (1920-2000): A Cross Country Comparative Study.* New Delhi: Orient Longman Pvt.

Sikand, Y. (2006). The Tablighi Jama'at and Politics: A Critical Re-Appraisal. *The Muslim World.* 96: 175-195.

Turner, Victor (1987). *Betwixt and Between: The Limminal Period in Rites of Passage. Open court.* La Salle, Illinois.

Veer, Peter Van der (2001). Transnational Religion, WPTC-01-18, University of Amsterdam, Paper given to the conference on Transnational Migration: Comparative Perspectives. Princeton University, 30 June- 1 July 2001.

উল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ ছাখাওয়াত (১৯৯৭)। *ফাজায়েলে আমল*। কোরআন মঞ্জিল প্রকাশনা, ঢাকা।

চিশতি, হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৯৯৪)। *বেহেশ্‌তী জেওর*। ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী।

নদভী এস.এ.এইচ. আলী (১৯৯৯)। *হযরত মাওলানা ইলয়াস (রা:) ও তার দ্বীনি দাওয়াত*। মোহাম্মদী বুক হাউজ।

নিজামী, শামসুন্নাহার (২০০৪)। *দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব*। আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা।

বোখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (২০০৬)। বোখারী শরীফ। ঢাকা: মীনা বুকহাউস।

হোসেন, মোহাম্মদ ইকরাম (২০০৩)। *মহিলাদের তাবলীগের মেহনত*। ঈমানিয়াত প্রকাশনী, ঢাকা।